# টুনটুনি আর রাজার কথা

উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী

রাজার বাগানের কোণে টুনটুনির বাসা ছিল। রাজার সিন্দুকের টাকা রোদে শুকোতে দিয়েছিল, সন্ধ্যার সময় তাঁর লোকেরা একটি টাকা ঘরে তুলতে ভুলে গেল । টুনটুনি সেই চকচকে টাকাটি দেখতে পেয়ে তার বাসায় এনে রেখে দিলে, আর ভাবল, "ইস! আমি কত বড়লোক হয়ে গেছি! রাজার ঘরে যে ধন আছে, আমার ঘরে সে ধন আছে!' তারপর থেকে সে খালি এই কথাই ভাবে, আর বলে—

'রাজার ঘরে যে ধন আছে,

টুনির ঘরে সে ধন আছে!'

রাজা তার সভায় বসে সে কথা শুনতে পেয়ে জিগ্যেস করলেন, 'হ্যাঁরে! পাখিটা কী বলছে রে?'

সকলে হাতজোড় করে বলল, 'মহারাজ, পাখি বলছে, আপনার ঘরে যে ধন আছে, ওর ঘরেও নাকি সেই ধন আছে!'

শুনে রাজা খিলখিল করে হেসে বললেন, 'দেখ তো ওর বাসায় কী আছে!'

তারা দেখে এসে বলল, 'মহারাজ, বাসায় একটি টাকা আছে।'

শুনে রাজা বললেন, 'সে তো আমারই টাকা, নিয়ে আয় সেটা। তখুনি লোক গিয়ে টুনটুনির বাসা থেকে টাকাটি নিয়ে এল। সে বেচারা আর কী করে, সে মনের দুঃখে বলতে লাগল—

'রাজা বড় ধনে কাতর

টুনির ধন নিলে বাড়ির ভিতর!'

শুনে রাজা আবার হেসে বললেন, 'পাখিটা তো বড় ঠ্যাঁটা রে! যা, ওর টাকা ওকে ফিরিয়ে দিয়ে আয়।'

টাকা ফিরে পেয়ে টুনির বড় আনন্দ হয়েছে। তখন সে বলছে—

'রাজা ভারি ভয় পেল

টুনির টাকা ফিরিয়ে দিল।'

রাজা জিগ্যেস করলেন, 'আবার কী বলছে রে?'

সভার লোকেরা বলল, 'বলছে যে মহারাজা নাকি বড্ড ভয় পেয়েছেন, তাই ওর টাকা ফিরিয়ে দিয়েছেন।'

শুনেই তো রাজামশাই রেগে একবারে অস্থির! বললেন, 'কী, এত বড় কথা! আন্ তো ধরে, বেটাকে ভেজে খাই!'

যেই বলা অমনি লোক গিয়ে টুনটুনি বেচারাকে ধরে আনলে। রাজা তাকে মুঠোয় করে নিয়ে বাড়ির ভিতর গিয়ে রানিদের বললেন, 'এই পাখিটাকে ভেজে আজ আমাকে খেতে দিতে হবে।

বলে তো রাজা চলে এসেছেন, আর রানিরা সাতজনে মিলে সেই পাখিটাকে দেখছেন। একজন বললেন, 'কী সুন্দর পাখি! আমার হাতে দাও তো একবার দেখি!' বলে তিনি তাকে হাতে নিলেন। তা দেখে আবার একজন দেখতে চাইলেন। তাঁর হাত থেকে যখন আর একজন নিতে গেলেন, তখন টুনটুনি ফসকে গিয়ে উড়ে পালাল। কী সর্বনাশ! এখন উপায় কী হবে? রাজা জানতে পারলে তো রক্ষা থাকবে না! এমনি করে তাঁরা দুঃখ করছেন, এমন সময় একটা ব্যাঙ সেইখান দিয়ে থপ থপ করে যাচ্ছে। সাত রানি তাকে দেখতে পেয়ে খপ করে ধরে ফেললেন, আর বললেন, 'চুপ চুপ! কেউ যেন জানতে না পারে! এইটাকে ভেজে দি, আর রাজামশাই খেয়ে ভাববেন টুনটুনিই খেয়েছেন।'

সেই ব্যাঙটার ছাল ছাড়িয়ে তাকে ভেজে রাজামশাইকে দিলে তিনি খেয়ে ভারি খুশি হলেন। তারপর সবে তিনি সভায় গিয়ে বসেছেন, আর ভাবছেন, 'এবার পাখির বাছাকে জব্দ করেছি!'

অমনি টুনটুনি বলছে—

'বড় মজা, বড় মজা,

রাজা খেলেন ব্যাঙ ভাজা!'

শুনেই তো রাজামশাই লাফিয়ে উঠেছেন! তখন তিনি থুতু ফেলেন, ওয়াক তোলেন, মুখ ধোন, আরও কত কী করেন। তারপর রেগে বললেন, 'সাত রানির নাক কেটে ফেল!' অমনি জল্লাদ গিয়ে সাত রানির নাক কেটে ফেললে।

তা দেখে টুনটুনি বলল–

'এক টুনিতে টুনটুনাল

সাত রানির নাক কাটাল!'

তখন রাজা বললেন, 'আন্ বেটাকে ধরে! এবারে গিলে খাব! দেখি কেমন করে টুনটুনিকে ধরে আনলে। রাজা বললেন, 'আন্ জল!' জল এল। রাজা মুখ ভরে জল নিয়ে টুনটুনিকে মুখে পুরেই চোখ বুজে ঢক করে গিলে ফেললেন। সবাই বললে, 'এবার পাখি জব্দ!'

বলতে বলতেই রাজামশাই ভোক করে মস্ত একটা ঢেকুর তুললেন।

সভার লোক চমকে উঠল, আর টুনটুনি সেই ঢেকুরের সঙ্গে বেরিয়ে এসে উড়ে পালাল।

রাজা বললেন, 'গেল, গেল! ধর, ধর!' অমনি দুশো লোক ছুটে গিয়ে বেচারাকে আবার ধরে আনল। তারপর আবার জল নিয়ে এল, আর সিপাই এসে তলোয়ার নিয়ে রাজামশায়ের কাছে দাঁড়াল, টুনটুনি বেরুলেই তাকে দুই টুকরো করে ফেলবে। এবার টুনটুনিকে গিলেই রাজামশাই দুই হাতে মুখ চেপে বসে থাকলেন, যাতে টুনটুনি আর বেরুতে না পারে। সে বেচারা পেটের ভিতরে গিয়ে ভয়ানক ছটফট করতে লাগল।

খানিক বাদে রাজামশাই নাক সিটকিয়ে বললেন, 'ওয়াক!' অমনি টুনটুনিকে-সুদ্ধ তাঁর পেটের ভিতরের সকল জিনিস বেরিয়ে এল। সবাই বলল, 'সিপাই, সিপাই! মারো, মারো! পালাল!' সিপাই তাতে থতমত খেয়ে তলোয়ার দিয়ে যেই টুনটুনিকে মারতে যাবে, অমনি সেই তলোয়ার টুনটুনির গায়ে না পড়ে রাজামশায়ের নাকে গিয়ে পড়ল।

রাজামশাই তো ভয়ানক চ্যাচালেন, সঙ্গে সঙ্গে সভার সকল লোক চ্যাঁচাতে লাগল । তখন ডাক্তার এসে ওষুধ দিয়ে পটি বেঁধে অনেক কষ্টে রাজামশাইকে বাঁচাল।

টুনটুনি তা দেখে বলতে লাগল—

'নাক-কাটা রাজা রে

দেখ তো কেমন সাজা রে!'

বলেই সে উড়ে সে দেশ থেকে চলে গেল। রাজার লোক ছুটে এসে দেখল, খালি বাসা পড়ে আছে।

## সাত ভাই চম্পা

যোগীন্দ্রনাথ সরকার

এক ছিলেন রাজা, তাঁহার সাত রানি। রানিদের কাহারও ছেলেপিলে ছিল না, তাই রাজার ভারি দুঃখ!

একদিন রাজা মৃগয়া করিতে গিয়াছেন, এমন সময় চর আসিয়া খবর দিল, 'সুয়োরানির সুন্দর সাতটি ছেলে ও একটি মেয়ে হয়েছে।' শুনিয়া রাজার আনন্দ আর ধরে না। তাড়াতাড়ি মৃগয়া সারিয়া বাড়ি ফিরিলেন।

এদিকে এক কাণ্ড হইয়াছে। সুয়োরানি রাজার প্রিয় বলিয়া আর ছয় রানি তাঁহাকে হিংসা করিত। রাজা ফিরিয়া আসিবার পূর্বেই তাহারা সেই আটটি শিশুকে পাঁশগাদায় পুঁতিয়া ফেলিল। রাজা আসিয়া ছেলে-মেয়েদের দেখিতে চাহিলে, তাহারা ব্যাঙ, ইঁদুর, কাঁকড়া, বিছা প্রভৃতি ধরিয়া আনিয়া বলিল, 'এই দেখ, তোমার সুয়োরানির সাধের ছেলে-মেয়ে!'

দুষ্টু রানিদের কৌশলে রাজার মাথা ঘুরিয়া গেল। রাগে গরগর করিতে করিতে তিনি সুয়োরানিকে রাজবাড়ি হইতে তাড়াইয়া দিলেন। আহা! দুঃখিনী আর কী করিবেন, কোথায় যাইবেন— ঘুঁটেকুড়ানি দাসী হইয়া পথে পথে ঘুরিতে লাগিলেন!

কিছুকাল পরে, রাজার বাপের শ্রাদ্ধ উপস্থিত— ফুলের দরকার। মালী ফুল আনিতে গিয়া দেখে, সারা বাগান শুকনা ফুল তো দূরের কথা, কোথাও একটি কুঁড়িও নাই। সে আর কী করিবে, ভয়ে ভয়ে ফিরিয়া আসিতেছে, এমন সময় - দেখিল— পাঁশগাদায় সাতটি সুন্দর চাঁপাগাছ ও একটি পারুল গাছ হইয়াছে। আর প্রতি গাছে একটি করিয়া সুন্দর ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে। ফুলগুলি দেখিয়া মালীর বড়ই আনন্দ হইল; কিন্তু সে যেই হাত বাড়াইয়াছে, অমনি পারুল ফুলটি চাঁপা ফুলগুলিকে বলিয়া উঠিল:-

সাত ভাই চম্পা জাগরে!

চাঁপারা উত্তর করিল: কেন বোন পারুল ডাক রে?

পারুল

রাজার মালি এসেছে,

ফুল দিবে কি না দিবে?

চাঁপা

না দিব না দিব ফুল,

উঠিব শতেক দূর;

আগে আসুক রাজা,

তবে দিব ফুল।

ফুলগুলির কথা শুনিয়া মালী তো একেবারে অবাক! সে রাজাকে গিয়া সকল কথা বলিল। রাজা আশ্চর্য হইয়া নিজেই ফুল তুলিতে আসিলেন; কিন্তু যেই হাত বাড়াইয়াছেন, অমনি শুনিতে পাইলেন:

পারুল। সাত ভাই চম্পা জাগ রে!

চাঁপা। কেন বোন পারুল ডাক রে!

পারুল। রাজা নিজে এসেছে, ফুল দিবে কি না দিবে?

চাঁপা। না দিব না দিব ফুল, উঠিব শতেক দূর;

আগে আসুক বড়রানি, তবে দিব ফুল।

তখন রাজার হুকুমে ঘুঁটেকুড়ানি দাসী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সুয়োরানি হাত বাড়াইতেই, ফুলগুলি সুন্দর সাতটি ছেলে ও একটি মেয়ের বেশ ধরিয়া তাঁহার কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

ব্যাপার দেখিয়া সকলে অবাক। রাজা শিশুগুলিকে কাছে ডাকিয়া, তাহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন তাহারা একবাক্যে বলিল, 'আমরা তোমার ছেলে-মেয়ে; সুয়োরানি আমাদের মা। তুমি যখন মৃগয়া করতে যাও, তখন আমরা ভূমিষ্ঠ হই। কিন্তু মায়ের উপর হিংসে করে তোমার অন্য ছয় রানি আমাদিগকে পাঁশগাদায় পুঁতে রেখেছিলেন। আমরা সেখানে চাঁপা ও পারুল গাছে ফুল হয়ে ফুটেছিলাম।'

শিশুগুলির কথা শুনিয়া চোখের জলে রাজার বুক ভাসিতে লাগিল। এমন সোনার চাঁদ ছেলে-মেয়ে থাকিতে এতদিন কী কষ্টেই-না তাঁহার দিন কাটিয়াছে! আর দুঃখিনী ৯২ সুয়োরানিকে কী ভয়ানক যন্ত্রণাই না সহ্য করতে হইয়াছে! ভাবিতে ভাবিতে ক্রমে তিনি আগুন হইয়া উঠিলেন! তখন ছয় রানির কাঁপুনি যদি দেখিতে! রাজা তাহাদিগকে 'হেঁটে কাঁটা— উপরে কাঁটা' দিয়া পুঁতিয়া ফেলিতে আজ্ঞা দিলেন। তারপর সুয়োরানিকে লইয়া সুখে স্বচ্ছন্দে ঘরকন্না করিতে লাগিলেন।

আমার কথাটি ফুরুল;

নটে গাছটি মুড়ল।

## বাঁদর এল কোথা থেকে

সৈয়দ রেজাউল করিম

আজকালের কথা নয়, সে অনেক দিন আগের কথা। তখন তিমোর-এ একটা খুব ছোটো দ্বীপ ছিল। সেই দ্বীপের নাম রোচি। সেখানে বাস করত এক বুড়ি ও তার নাতনি। নাতনির নাম ছিল কপিলা। দিদা তাকে আদর করে কপি বলে ডাকত। বুড়ির অবস্থা তেমন ভালো ছিল না। মাথা গোঁজার জন্য ছোটো একটা চৌকোনা কুঁড়েঘর ছিল। আর ছিল একফালি জমি। সেখানে দিদা আর নাতনি শাকসবজির চাষ করত। তা দিয়ে তাদের দুবেলা ভাত জুটত না। বাধ্য হয়ে বুড়ি চলে যেত সমুদ্রে মাছ ধরতে। আর ঘরে তখন থাকত নাতনি। সে ঘরদোর ঝাড়পোছ করত, রান্নাবান্না করত। দুপুর নাগাদ মাছ নিয়ে বাড়ি ফিরত দিদা। তারপর মাছ রান্না হত। তাই খেয়ে কোনোরকমে দিন কাটত তাদের।

সেদিন মাছ ধরতে যাবার আগে কপিলাকে ডেকে দিদা বলল, "আজ আর বেশি কিছু রাঁধতে হবে না। একটা দানা চাল রান্না করলেই চলবে।"

বুড়িদিদা চলে যাবার পর টনক নড়ল কপিলার। তাকে কী বলে গেল দিদিমা ? সে-কথার কোনো মানে খুঁজে পেল না সে। ভেবে উঠতে পারল না, একটা দানা রান্না করার কথা কেন বলে গেল দিদিমা ! একটা দানায় কি পেট ভরবে দু'জনের? অনেক ভাবনাচিন্তা করে অবশেষে দু'মুঠো চাল নিয়ে রাঁধতে বসল সে।

গনগনে আগুনে টগবগ করে ফুটে উঠল জল, ফেঁপে ফুলে উঠল চাল। উথলে ওঠা মাড় ঠেলে ফেলে দিল হাঁড়ির ঢাকনা। হাঁড়ির গা বেয়ে অঝোরে গড়িয়ে পড়তে থাকল মাড়ভাত। এমনভাবে মাড়ভাত পড়তে কখনো দেখেনি কপিলা, দেখে তার কান্না পেল। মনে মনে ভাবতে থাকল, কী করে সে এটা বন্ধ করবে। সেই মুহূর্তে কোনো উপায় খুঁজে পেল না সে। ভয়ে সে ঘরের মধ্যে ছোটাছুটি করতে থাকল।

হাঁড়ি থেকে তখনও মাড়ভাত উথলে পড়ছিল। পড়তে পড়তে ভরে গেল সারাটা ঘর। একসময় ঘর ছাপিয়ে উঠোনে গিয়ে পড়ল, উঠোন থেকে রাস্তায় নদীর মতো বয়ে চলল সে- ধারা।

উপায় না দেখে কপিলা ছুট দিল সমুদ্রের দিকে। যেদিকে তার দিদিমা মাছ ধরতে গেছে। মাড়ের ধারাও পিছু নিল কপিলার।

দিদিমা তখন মাছ ধরে বাড়ি ফিরছিল। পথে দেখা কপিলার সঙ্গে। কপিলা তাকে জড়িয়ে ধরে কাদতে কাদতে বলল সব কথা। পিছনে যে ভাতের মাড় তাড়া করে আসছে তাও দেখাল সে।

দিদিমার খুব রাগ হল। চিৎকার করে উঠল, "অবাধ্য মেয়ে কোথাকার। তোকে একটা দানা...." সাপের মতো ফুঁসতে থাকল দিদিমা।

পথের মাঝে একটা কাঠের চেলা পড়েছিল। হাতে তুলে নিল সেটা। কোনো কিছু না- ভেবেই কপিলার পিঠে বসিয়ে দিল সজোরে। মারের চোটে যন্ত্রণায় কঁকিয়ে উঠল কপিলা। তারপর ম্যাজিকের মতো অদৃশ্য হয়ে গেল কপিলা। দিদিমা দেখতে পেল সেখানে দাঁড়িয়ে আছে একটা বাঁদর।

বাঁদরটা হাততালি দিয়ে নাচতে থাকল। একসময় সে গাছের ডালে চড়ে বসল। তারপর মুখ ভেংচে বলল, "এখন থেকে তুমি একাই থাকো দিদিমা, আমি আর তোমার সঙ্গে যাব না। তোমার জন্য রান্নাবান্না করে দেব না। তুমি নিজের হাতে সব করবে। কেউ তোমাকে ভালোবাসবে না।"

কপিলার দিদা এখন আর নেই। কিন্তু রোচি দ্বীপের লোকজনেরা আজও মনে রেখেছে সে কাহিনি। ভুলেও তারা তাদের ছেলেপুলেদের মারধোর করে না কখনোও। কে জানে, মার খেয়ে তাদের ছেলেমেয়েরা যদি বাঁদর হয়ে যায়।

## বোকা কুমির আর হরিণ

সুখেন্দু মজুমদার

বনে বনে ঘুরে হরিণ খুব ক্লান্ত। পিপাসা পেয়েছে তার, জল পায় কোথায় ? কোথায় জল? পাশেই ছিল নদী। হরিণ চলল নদীর কাছে জল খেতে। যেতে যেতে থমকে দাঁড়াল সে। কেন দাঁড়াল? হরিণ জানে নদীতে কুমির আছে। পাড়ের কাছাকাছি লুকিয়ে চুরিয়ে আছে জলের তলায়। যেই নামবে জল খেতে, কুমির অমনি... কুমির কী করবে শুনি?

কী আর করবে। খপাৎ করে পা-টা ধরে নিয়ে যাবে জলের তলায় আর তারপর খেয়ে ফেলবে।

হরিণ জল খাবে কী করে?

হরিণ মনে মনে একটা মতলব আঁটল। সে চেঁচিয়ে বলল, দেখি তো নদীর জলটা কি সত্যি সত্যি গরম? আমি বরং আগে-ভাগে পা ডুবিয়ে দেখে নিতে চাই। তারপর খেতে হয় খাব।

কী করল হরিণ?

যেটা বলল সেটা না করে মুখে করে একটা লাঠি নিয়ে তার অন্য প্রান্তটা জলের মধ্যে রাখল।

যেই না রাখা, খপাৎ করে লাঠিটা কুমির নিয়ে গেল এক্কেবারে জলের তলায়। হি হি করে হেসে উঠল হরিণ। আর হাসতে হাসতে সে বলল, কী বোকা কুমির, কোনটা লাঠি আর কোনটা যে সত্যিকারের পা সেটাও চেনে না। হাসতে হাসতে হরিণ চলে গেল খানিক দূরে। নদীতে গিয়ে মজা করে জল খেয়ে ফিরে গেল বনে।

আর কোনওদিন জল খেতে আসেনি?

জল না খেলে কেউ কি বাঁচে? আবার আরেকদিন হরিণ এসেছে জল খেতে। এসে দেখে কী, নদীতে একটা কাঠের বড়ো টুকরো ভাসছে। হরিণ জানে কুমির যখন জলে ভাসে তখন তাকে ঠিক কাঠের টুকরোর মতো দেখায়। মনে মনে আবার মতলব আঁটল হরিণ। আরও জোরে চেঁচিয়ে বলল, কাঠের টুকরোটা সত্যি যদি কুমির হয় তবে আমার সঙ্গে কথা বলবে না। কুমির না হয়ে আর সত্যি যদি কাঠের টুকরোই হয় তবে আমার সঙ্গে খোশগল্প জুড়ে দেখে। তারপর? তারপর আর কী। হরিণের কথা যেই শেষ হয়েছে, অমনি সে শুনতে পেল একটা কর্কশ আওয়াজ। জলের তলায় মুখ রেখে কুমির বলল, বিশ্বাস করো, আমি সত্যি কাঠের টুকরো। কাঠের টুকরো আবার কথা বলতে পারে নাকি? সেটা কখনো হয়!

তাই তো হরিণ হি হি করে হেসে উঠল। হাসতে হাসতে ভাবল, বোকা কুমির এটাও জানে না। তারপর হরিণ ফিরে গেল বনে।

একবার। দু'বার। আর কি হরিণ এসেছিল কুমিরের কাছে?

হ্যাঁ হ্যাঁ আরও একদিন এসেছিল। কেন জানো?

নদীর এ-পারে থাকতে তার আর ইচ্ছে করছিল না। নদীর ওপারে নাকি প্রচুর রসালো ফলমূল আর কচি কচি পাতা আছে। হরিণের খুব ইচ্ছে সে-সব খাওয়ার। কিন্তু নদী পেরোবে কী করে? নদী পেরোবার আগেই কুমির যদি খেয়ে ফেলে।

এবারও হরিণের মাথায় এল একটা দুর্দান্ত মতলব। যেই না আসা হরিণ চেঁচিয়ে উঠল, ওহে কুমির ভায়া...

তক্ষুনি জলের নীচ থেকে গর্জন করে উঠল কুমির, আরে আরে হরিণভায়া যে। আমার সকালের ভোজনের জন্য বুঝি তুমি এসেছ?

না না কুমিরভায়া। আজকে আমি অন্য একটা কাজ নিয়ে এসেছি তোমাদের কাছে। বলল হরিণ। অন্য কাজ?

সেটাই তো বলছি। হরিণ বলল, রাজা আমাকে পাঠিয়েছেন। এই নদীতে কত কুমির থাকে আজই গুনে তাঁকে বলতে হবে।

রাজা বলেছেন? খানিকটা ভয় পেয়েই কুমির বলল, আমাদের কী করতে হবে শুনি। তেমন কিছুই না। তোমরা সব কুমির নদীর এপার থেকে ও-পার পর্যন্ত সার দিয়ে ভেসে থাকো। আমি এক দুই তিন চার করে পর পর সব গুনে নেব।

কুমির চলে গেল তার পরিবারের লোকজনদের খবর দিতে। তারপর একে একে পাড়াপড়শি বন্ধুবান্ধব যারা ছিল সবাইকে খবর দিয়ে জড়ো করে সার দিয়ে ভেসে থাকতে বলল। সবাই হাজির। হরিণ বলল, এবার গোনা শুরু।

হরিণ একটা করে কুমিরের পিঠে লাফায় আর বলে, এক, তার পরেরটার পিঠে উঠে বলল, দুই! এমনি করে তিন....চার... পাঁচ। যতক্ষণ না হরিণ নদীর ওপাড়ে নামল। গোনা থামতেই কুমির চিৎকার করে উঠল, গোনা শেষ হয়েছে? হরিণ বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ তোমরা সত্যি সত্যি অনেক। কিন্তু... কিন্তু কী? কুমির বলল।

আসলে তোমরা বোকার হদ্দ। কোথাগুলো বলে গান গাইতে গাইতে হরিণ চলল নতুন বনের খোঁজে।